Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## আমার সন্তান আমার জান্নাত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ জাহিদ হাসান

রোলঃ 228011083


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## আমার সন্তান আমার জান্নাত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ জাহিদ হাসান

রোলঃ 228011083

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমার সন্তান আমার জান্নাত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ জাহিদ হাসান, আইডিঃ 228011083 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমার সন্তান আমার জান্নাত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**মোঃ জাহিদ হাসান**

আইডিঃ 228011083

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... 6

আদর্শ সন্তান গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা ..... 20

ইসলামে সু-সন্তান তৈরির গুরুত্ব ..... 26

নেককার সন্তান তৈরির সামাজিক উপকারিতা ..... 32

বর্তমান সমাজে সু-সন্তান তৈরির প্রতিবন্ধকতা ..... 37

নেককার সন্তান জান্নাতের পথ সুগম করে ..... 47

উপসংহার ..... 51

# ভূমিকা

মানবজীবনের সবচেয়ে নির্মল, গভীর ও পবিত্র সম্পর্ক হলো পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। সন্তান শুধু একটি পরিবারের অংশ নয়, বরং পিতা-মাতার জীবনের স্বপ্ন, ত্যাগ, ভালোবাসা ও আশার প্রতীক। সন্তান প্রতিটি পিতা-মাতার জীবনের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। সন্তান ছাড়া জীবন যেন অসম্পূর্ণ, শূন্য এবং নির্জীব।

সন্তান আল্লাহ তায়ালার অমূল্য দান, পিতা-মাতার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। সন্তান ছাড়া একটি পরিবার কল্পনাই করা যায় না। সন্তানই জীবনের পরিপূর্ণতা এনে দেয়, নতুন আশার প্রদীপ জ্বালায়। পিতা-মাতার চোখে সন্তানের হাসিই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য, আর তার আনন্দই জান্নাতের সুবাস ছড়িয়ে দেয়।

একজন মা-বাবার জীবনে সন্তানের জন্ম এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। শিশুর প্রথম কান্না, প্রথম হাসি, প্রথম ডাক—সবই পিতা-মাতার হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় সুখ এনে দেয়। যখন সন্তান প্রথম "মা" বা "বাবা" বলে ডাকে, তখন তাদের চোখে আনন্দের অশ্রু ঝরে। সেই মুহূর্তে তারা অনুভব করেন, যেন জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে গেছে।

সন্তান শুধু ব্যক্তিগত আনন্দের উৎস নয়, বরং সমাজ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতা। একজন শিক্ষিত, নৈতিক ও মানবিক সন্তানই পারে পরিবার, সমাজ ও দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে। তাই পিতা-মাতার প্রধান দায়িত্ব হলো সন্তানকে সুশিক্ষা, চরিত্রগঠন ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোয় গড়ে তোলা। শিক্ষার পাশাপাশি ভালো আচরণ, মানবিকতা, সততা ও পরোপকারের শিক্ষা দিতে হবে ঘর থেকেই।

ইসলামী শিক্ষায় সন্তানকে শুধু আনন্দের উৎস নয়, বরং আমানত বা দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন —"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে; পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা মজুসি বানিয়ে ফেলে।" (সহিহ বুখারি)অর্থাৎ, সন্তান জন্মগতভাবে নিষ্পাপ, তার চরিত্র ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে পিতা-মাতার শিক্ষা, আচরণ ও পরিবেশের উপর।

একজন সন্তানের নৈতিক, সামাজিক ও মানসিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা সর্বাধিক। ভালোবাসা, স্নেহ, শিক্ষা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মাধ্যমে সন্তানকে গড়ে তোলা যায় মানবিক ও আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে। সুশিক্ষিত ও সৎ সন্তান কেবল পিতা-মাতার নয়, সমাজ ও জাতির জন্যও আশীর্বাদ।

আজকের প্রতিযোগিতামূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজে সন্তান লালন-পালন আগের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তাই পিতা-মাতার উচিত সন্তানকে সময় দেওয়া, তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, এবং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তার চরিত্র গঠন করা। সন্তানের হাসি পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের অনুভূতি এনে দেয়, আর তার সৎ জীবন পিতা-মাতার জন্য প্রকৃত মুক্তির পথ তৈরি করে।
সব মিলিয়ে বলা যায়, সন্তান হলো পিতা-মাতার জীবনের আনন্দ, ভালোবাসা, ত্যাগ ও জান্নাতের প্রতিচ্ছবি। তার উপস্থিতিতে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কুরআন ও হাদিসের পর্যালোচনা
কুরআনের আয়াত

اعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّ اَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা। আর নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর নিকট আছে মহা পুরস্কার। [ সূরাঃ আল-আনফাল আয়াত: ২৮ ]

ফিতনা' শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমন সব বিষয়কেও ফিতনা বলা হয়, যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই 'ফিতনা' শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বস্তুত এখানে তিনটি অর্থেরই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সন্তান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাপে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়াটা একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমত ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিই তেমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্থিব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় এ কথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আখিরাতে তার জন্য সাপ, বিচ্ছু ও আগুনের পোড়ার কারণ হবে। যেমন কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফিল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহ্কামের প্রতি

অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়ে যায়। আয়াত শেষে বলা হয়েছেঃ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

اِنَّمَآ اَمۡوَالُكُمۡ وَ اَوۡلَادُكُمۡ فِتۡنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنۡدَهٗۤ اَجۡرٌ عَظِيۡمٌ

তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান। [ সূরাঃ আত-তাগাবুন আয়াত : ১৫]

(কুফর যেমন পরকালীন সাফল্যের পথে পুরোপুরি বাধা, তেমনি ধনসম্পদ, সন্তান সন্ততি, স্ত্রী ইত্যাদিতে মশগুল হয়ে আল্লাহর আদেশ পালনে ত্রুটি করাও এক পর্যায়ে পরকালীন সাফল্যের পথে বাধা। তাই বিপদাপদে এরূপ মনে করা উচিত যে কোন বিপদ আল্লাহর আদেশ ব্যতিরেকে আসে না। (এরূপ মনে করে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করা উচিত)। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি (পূর্ণ) বিশ্বাস রাখে, তিনি তার অন্তরকে (সবর ও সন্তুষ্টির) পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (কে সবর ও সন্তুষ্টি অবলম্বন করল, কে করল না, তিনি সব জানেন এবং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিদান ও শাস্তি দেন। সারকথা এই যে, বিপদাপদসহ প্রত্যেক ব্যাপারে) আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুল (সা)-এর আনুগত্য কর। যদি তোমরা (আনুগত্য থেকে ) মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে (মনে রেখ,) আমার রসূল (সা)-এর দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌছিয়ে দেওয়া। (এই দায়িত্ব তিনি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তাই তাঁর কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি তোমাদেরই হবে। আল্লাহর ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই, তাই এখানে তা বর্ণনা করা হয়নি। তোমাদের এবং বিশেষভাবে বিপদগ্রস্তদের এরূপ মনে করা উচিত যে,) তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের (ধর্মের) দুশমন (যদি তারা নিজেদের ইহলৌকিক উপকারের জন্য এমন বিষয়ের আদেশ করে, যাতে তোমাদের পারলৌকিক অনিষ্ট আছে।) অতএব তোমরা তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাক (এবং তাদের উক্তরূপ আদেশ পালনে বিরত থাক।) যদি (তোমরা এরূপ ফরমায়েশের কারণে রাগ করে তাদের প্রতি কঠোরতা কর এবং তারা ক্ষমা চেয়ে তওবা করে নেয়, তবে এরপর যদি) তোমরা ( তাদের তখনকার ত্রুটি ) মার্জনা কর (অর্থাৎ শাস্তি না দাও), উপেক্ষা কর (অর্থাৎ বেশী তিরস্কার না কর) এবং ক্ষমা কর ( অর্থাৎ তা মনে ও মুখে ভুলে যাও) তবে আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের গুনাহের জন্য ) ক্ষমাশীল, (তোমাদের অবস্থার প্রতি) করুণাময়। ( এতে ক্ষমা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। শাস্তি দিলে নির্ভীক হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে ক্ষমা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোন কোন সময় ক্ষমা করা মোস্তাহাব। অতঃপর ধনসম্পদ

সম্পর্কে সন্তান-সন্ততির ন্যায় বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে: ) তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। (উদ্দেশ্য এটা দেখা যে, কে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং কে স্মরণ রাখে। যে এতে মশগুল হয়ে আল্লাহকে স্মরণ রাখে, তার জন্য) আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। অতএব ( এসব কথা শুনে) তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, (তার আদেশ-নিষেধ) শুন, আনুগত্য কর এবং (বিশেষভাবে যেখানে ব্যয় করতে বলা হয়েছে, সেখানে) ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। (সম্ভবত এটা সুকঠিন বলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যারা মনের লালসা থেকে মুক্ত, তারাই (পরকালে) সফলকাম। (অতঃপর এই সফলতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে,) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম (আন্তরিকতাপূর্ণ ) ঋণ দান কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী (সৎকর্ম গ্রহণ করেন এবং) সহনশীল (গোনাহ করলে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না)। তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (এটি থেকে এখন পর্যন্ত বিষয়বস্তু সূরার বিষয়বস্তুর কারণ স্বরূপ )।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু,[1] অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো।[2] আর তোমরা যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তাহলে (জেনে রেখো যে,) নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [3] [ সূরাঃ আত-তাগাবুন আয়াত : ১৪]

[1] অর্থাৎ, যারা তোমাদের নেক কাজ ও আনুগত্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে, জেনে নিও তারা তোমার কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং শত্রু।

[2] অর্থাৎ, তুমি তাদের পিছনে পড়ো না, বরং তাদেরকে তোমার পিছনে লাগাও, যাতে তারাও আল্লাহর আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে নেয়। তুমি তাদের পিছনে পড়ে নিজের পরিণাম মন্দ করো না।

[3] এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ মক্কা ছেড়ে মদীনা আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কারণ, তখন হিজরত করার নির্দেশ বড়ই তাকীদের সাথে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিরা হিজরতের পথে বাধা সৃষ্টি করে তাঁদেরকে হিজরত করতে দিল না। পরে যখন তাঁরা রসূল (সাঃ)-এর নিকট এসে পড়লেন, তখন দেখলেন যে, তাঁদের পূর্বে আসা লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে অনেক কিছুই শিখে নিয়েছেন। তখন তাঁরা তাঁদের সেই স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি রাগান্বিত হলেন, যারা তাঁদেরকে হিজরত করতে বাধা দিয়েছিল। সুতরাং তাঁরা তাদেরকে

সাজা দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। মহান আল্লাহ এই আয়াতে তাঁদেরকে মার্জনা এবং উপেক্ষা করার কথা শিক্ষা দিলেন। (সুনানে তিরমিযী সূরা তাগাবুনের তাফসীর পরিচ্ছেদ)

اَلۡمَالُ وَ الۡبَنُوۡنَ زِيۡنَةُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۚ وَ الۡبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيۡرٌ عِنۡدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيۡرٌ اَمَلًا

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা; আর স্থায়ী সৎকাজ(১) আপনার রব-এর কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাংখিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।

(১) স্থায়ী সৎকাজ বলতে কুরআনে বর্ণিত বা হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক অনুমোদিত যাবতীয় নেককাজই বুঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন উক্তির মাধ্যমে তা স্পষ্ট হয়েছে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাস হারেস বলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একদিন বসলে আমরা তার সাথে বসে পড়লাম। ইতিমধ্যে মুয়াজ্জিন আসল। তিনি পাত্রে করে পানি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সে পানির পরিমাণ সম্ভবত এক মুদ (৮১৫.৩৯ গ্রাম মতান্তরে ৫৪৩ গ্রাম) পরিমান হবে। (দেখুন, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা) তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে পানি দ্বারা অজু করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এ অজুর মত অজু করতে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি কেউ আমার অজুর মত অজু করে জোহরের সালাত আদায় করে তবে এ সালাত ও ভোরের মাঝের সময়ের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। তারপর যদি আসরের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও জোহরের সালাতের মধ্যকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

এরপর যদি মাগরিবের সালাত আদায় করে তবে সে সালাত ও আসরের সালাতের মধ্যে কৃত গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তারপর এশার সালাত আদায় করলে সে সালাত এবং মাগরিবের সালাতের মধ্যে হওয়া সমূদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এরপর সে হয়ত: রাতটি ঘুমিয়েই কাটিয়ে দিবে। তারপর যখন ঘুম থেকে জেগে অজু করে এবং সকালের সালাত আদায় করে তখন সে সালাত এবং এশার সালাতের মধ্যকার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর এগুলোই হলো এমন সৎকাজ যেগুলো অপরাধ মিটিয়ে দেয়। লোকেরা এ হাদীস শোনার পর বলল, হে উসমান এগুলো হলো “হাসানাহ” বা নেক-কাজ। কিন্তু “আল-বাকিয়াতুস সালেহাত” কোনগুলো? তখন তিনি বললেন, তা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ এবং লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। [মুসনাদে আহমাদ: ১/৭১]

ۡ ءِىۡ وَ كَانَتِ امۡرَاَتِىۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِىۡ مِنۡ لَّدُنۡكَ وَلِيًّا

নিশ্চয় আমি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে আশংকা করি।[1] আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে[2] আমাকে দান কর একজন উত্তরাধিকারী। [ সূরা মরিয়ম আয়াত:৫]

[1] এই আশংকার অর্থ এই যে, যদি আমার কোন উত্তরাধিকারী আমার ওয়ায ও উপদেশের দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তাহলে আমার স্বগোত্রীয় আত্মীয়দের মধ্যে তো কেউ এর যোগ্য নেই। আর এর ফলস্বরূপ হয়তো আমার আত্মীয়রা তোমার রাস্তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

[2] 'তোমার নিকট হতে' এর অর্থ যদিও আমার বাহ্যিক সন্তান-সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, তবুও তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে একটি সন্তান দান কর। (যে আমার ওয়ারেস ও উত্তরাধিকারী হবে।)

يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ ؕيَهَبُ لِمَنۡ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنۡ يَّشَآءُ الذُّكُوۡرَ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তা'ই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। [ সূরাঃ আশ-শূরা আয়াত : ৪৯]

اَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجۡعَلُ مَنۡ يَّشَآءُ عَقِيۡمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيۡمٌ قَدِيۡرٌ

অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [ সূরাঃ আশ-শূরা আয়াত : ৫০]

আল্লাহ্ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন, যেমন হযরত নূত (আঃ)। আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন, যেমন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ)। আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন করেন, যেমন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)। সুতরাং চারটি শ্রেণী হলোঃ শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় সন্তানেরই অধিকারী এবং সন্তানহীন।তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন।সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের ঐ ফরমানের মতই যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ এটাকে যেন আমি লোকদের জন্যে নিদর্শন করি।"(১৯:২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি করেছি। হযরত আদম (আঃ)-

কে সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি দ্বারা, তার পিতাও ছিল। না, মাতাও ছিল না। হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষের মাধ্যমে। আর হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারীর মাধ্যমে। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টির করে মহাপ্রতাপান্বিত ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তার সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। ঐ স্থানটি ছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হলো সন্তানদের সম্পর্কে। ওটাও চার প্রকার এবং এটাও চার প্রকার। সুবহানাল্লাহ! এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّ لَا بَنُوْنَ

‘যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না’। [সূরাঃ আশ-শুআ'রা আয়াত: ৮৮]

আলোচ্য আয়াতের বহুলপ্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কিয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায়ে জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মু’মিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এই ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দান ও হিসাবের দাড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ্ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বেঈমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সৎকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সৎকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্য সুপারিশ করবে যেমন কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবূল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে; বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনিভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সৎকর্ম পিতামাতার সৎকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ্ তা’আলা বাপ দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপদাদার উচ্চতম স্তরে পৌঁছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْঅর্থাৎ আমি আমার সৎ বান্দাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে

দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কিয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মু'মিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমনকি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মু'মিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বরী দ্বারা কিয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না; যেমন হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র, লূত (আ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আ)-এর পিতার ব্যাপার তাই।

وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا
দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। [ সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল) আয়াত : ৩১]

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ দেখো, আমি তোমাদের উপর তোমাদের পিতামাতার চেয়েও বেশী দয়ালু। একদিকে তিনি পিতা-মাতাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-মাল প্রদান করে। আর অন্যদিকে তাদেরকে আদেশ করছেন যে, যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা না করে। অজ্ঞতার যুগে মানুষ তাদের কন্যাদেরকে উত্তরাধিকার সূত্রে মাল প্রদান করতো না এবং তাদেরকে জীবিত রাখাও পছন্দ করতো না। এমনকি কন্যা-সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া তাদের একটা সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এই জঘন্য প্রথাকে খণ্ডন করছেন। তিনি বলেছেনঃ এটা কতই না অবাস্তব ধারণা যে, তোমরা তাদেরকে খাওয়াবে কোথা থেকে?জেনে রেখো যে, কারো জীবিকার দায়িত্ব কারো উপর নেই। সবারই জীবিকার ব্যবস্থা মহান আল্লাহই করে থাকেন। সূরায়ে আনআমে রয়েছেঃ (আরবি) অর্থাৎ তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না, আমিই তাদেরকে ও তোমাদেরকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি।" তাদের হত্যা করা মহাপাপ।(আরবি) শব্দটি অন্য পঠনে (আরবি) রয়েছে। উভয়ের একই অর্থ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?" উত্তরে তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে বড় পাপ। এই যে, তুমি তাঁর শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" তিনি আবার জিজ্ঞেস করেনঃ এরপর

কোনটি? তিনি জবাবে বলেনঃ তুমি তোমার সন্তানদেরকে এই ভয়ে হত্যা করে ফেলবে যে, সে তোমার সাথে খাবে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ এরপর কোনটি?" তিনি। উত্তর দেনঃ তুমি তোমার প্রতিবেশিণীর সাথে ব্যভিচার করবে।" (এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে)

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ اِحۡسٰنًا ؕ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ كُرۡهًا وَّ وَضَعَتۡهُ كُرۡهًا ؕ وَ حَمۡلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوۡنَ شَهۡرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرۡبَعِيۡنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِىۡۤ اَنۡ اَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ الَّتِىۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَىَّ وَ عَلٰى وَالِدَىَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَ اَصۡلِحۡ لِىۡ فِىۡ ذُرِّيَّتِىۡ ۚ اِنِّىۡ تُبۡتُ اِلَيۡكَ وَ اِنِّىۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِيۡنَ

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'। [ সূরাঃ আল-আহকাফ, আয়াত :১৫ ]

অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা যত্ন ও আনুগত্য জরুরি হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষত মাতার কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এছাড়া এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

আয়াতের শুরুতেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময় কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্বাবস্থায় ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্বাবস্থায় জরুরি হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তান দেখাশোনা করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সন্তানের ওপর মাতার হক বেশি রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন, 'মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে"। [মুসলিম ২৫৪৮]

সন্তানদের যদিও মা-বাপ উভয়েরই সেবা করতে হবে কিন্তু গুরুত্বের দিক দিয়া মায়ের অধিকার এ কারণে বেশী যে, সে সন্তানের জন্য বেশী কষ্ট স্বীকার করে। এ আয়াত এ দিকেই ইংগিত করে। বিভিন্ন সহীহ হাদীস থেকেও এ বিষয়টি জানা যায়। আয়াতেও মায়ের তিনগুণ বেশী অধিকারের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছেঃ (১) কষ্ট করে মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে। (২) কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে এবং (৩) গর্ভধারণ ও দুধ পান করাতে ৩০ মাস লেগেছে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তা'আলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত দৃষ্টি বলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস।

কেননা সূরা আল বাকারাহ এর ২৩৩ নং আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু'বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্যদান ছাড়ানো ত্রিশ মাসে হয়। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে জনৈকা মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারি করেন। কেননা, এটা সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই সংবাদ অবগত হয়ে খলিফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম সময়কাল ছয় মাস। খলিফা তার যুক্তিপ্রমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করেন।

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু'বছর নির্ধারিত। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়। [দেখুন: ইবনে কাসীর]

وَ كَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوْهُمْ وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ

এরূপে তাদের দেবতাগণ বহু অংশীবাদীর দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করেছে[1] যাতে সে তাদের ধ্বংস সাধন করে এবং তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।[2] আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা এ করত না।[3] সুতরাং তাদের মিথ্যা নিয়ে তাদেরকে থাকতে দাও। [ সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত : ১৩৭ ]

[1] এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে সন্তানদেরকে তাদের জীবন্ত কবরস্থ করা অথবা মূর্তিদের নামে নজরানা পেশ করার প্রতি।

[2] অর্থাৎ, তাদের দ্বীনে শিরকের মিশ্রণ ঘটিয়ে।

[3] অর্থাৎ, মহান আল্লাহ স্বীয় এখতিয়ার ও কুদরতে তাদের ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতেন। তখন অবশ্যই তারা ঐ কাজ করতে পারত না, যার উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এ রকম করলে জোর-জবরদস্তি করা হত, আর তাতে মানুষকে পরীক্ষা করা যেত না। অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষকে ইচ্ছা ও এখতিয়ারের স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। তাই তিনি জোর-জবরদস্তি করেননি।

হাদিস

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

ইসমাঈল (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [ সহীহ বুখারি- ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৬৫৩ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭১৩৮ ]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَبُو حَفْصٍ التُّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

উকবা ইবনে আমার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদেরকে যথাসাধ্য উত্তম পোশাকাদি দেয়, তারা তার জন্য দোযখ থেকে রক্ষাকারী প্রতিবন্ধক হবে (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)।

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ صُحْبَتَهُمَا، إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মুসলিমের দুইটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে উত্তম সাহচর্য দান করে তারা তাকে বেহেশতে দাখিল করবে (ইবনে মাজাহ, হাকিম)।

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، يُؤْوِيهِنَّ، وَيَكْفِيهِنَّ، وَيَرْحَمُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثِنْتَيْنِ، يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: وَثِنْتَيْنِ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যার তিনটি কন্যা সন্তান আছে এবং সে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে এবং তাদের সাথে দয়ার্দ্র ব্যবহার করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। লোকজনের মধ্য থেকে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কারো যদি দুটি কন্যা সন্তান থাকে? তিনি বলেনঃ দুইটি কন্যা সন্তান হলেও (আবু দাউদ, তাবারানী, বাযযার)।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ :بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ :إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك

উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে একদল সাহাবা (সাহাবা) বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে উদ্দেশ করে বললেন, আমার হাতে এ কথার বায়'আত গ্রহণ কর যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার (যিনা) করবে না, নিজেদের সন্তানাদি (অভাবের দরুন) হত্যা করবে না। কারো প্রতি (যিনার) মিথ্যা অপবাদ দিবে না। শারী'আতসম্মত কোন বিষয়ে অবাধ্য হবে না। তোমাদের মধ্যে যারা এ সকল অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবে, তাদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে। অপরদিকে যে লোক (শির্ক ব্যতীত) অন্য কোন অপরাধ করবে এবং এজন্য দুনিয়ায় শাস্তি পেয়ে যাবে, তাহলে এ শাস্তি তার গুনাহ মাফ হবার কাফফারাহ্ হয়ে যাবে। আর যদি কোন গুনাহের কাজ করে, অথচ আল্লাহ তা ঢেকে রাখেন (বা ধরা না পড়ে), এজন্য দুনিয়ায় এর কোন বিচার না হয়ে থাকে, তাহলে এ কাজ আল্লাহর মর্যীর উপর নির্ভর করবে। তিনি ইচ্ছা করলে আখিরাতে তাকে ক্ষমা করে দিবেন

অথবা শাস্তিও দিতে পারেন। বর্ণনাকারী ('উবাদাহ্) বলেন, আমরা এ সকল শর্তানুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বায়'আত করলাম। (বুখারী, মুসলিম) সহীহ: বুখারী ১৮, মুসলিম ১৭০৯

➤অন্যায়ভাবে সকল হত্যাই হারাম। তা' সত্ত্বেও এ হাদীসে বিশেষভাবে সন্তান হত্যা নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য যে, এটা হত্যা ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শামিল। তাই একে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর এজন্য যে, সন্তান হত্যা তৎকালীন সময়ে ব্যাপক ছিল। তখন জীবিত কন্যা সন্তান প্রোথিত করা হত। আর দরিদ্রতার ভয়ে পুত্র সন্তান হত্যা করা হত।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ " ثُمَّ يَقُولُ )فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ(

আবদান (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সকল মানব শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) এর ওপর জন্ম গ্রহণ করে। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানিয়ে দেয়। যেমন জানোয়ার পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি পাও? পরে তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন। (আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর) যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এ-ই সরল দ্বীন। [সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৪১৭ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪৭৭৫ ]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

'আবদুল মালিক ইবনু রাবী' ইবনু সাবুরাহ্ থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শিশুর বয়স সাত বছর হলেই তাকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে এবং তার বয়স দশ বছর হয়ে গেলে (সালাত আদায় না করতে চাইলে) এজন্য তাকে প্রহার করবে। [ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), সালাতের অধ্যায়, হাদিস নাম্বার -৪৯৪]

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ ،وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে। [ সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), সালাতের অধ্যায়, হাদিস নাম্বার -৪৯৫]

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

ইয়াহইয়া ইবনু আইউব ও কুতায়বা (রহঃ) ... আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মারা যায় তখন তিন প্রকার আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়।

১. সাদাকায়ে জারিয়া অথবা

২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার সাধিত হয় অথবা

৩. নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।

# আদর্শ সন্তান গঠনে পিতা মাতার ভূমিকা

তিনি মানুষের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ব্যবস্থা কেন করলেন? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গেলে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ যেহেতু মানুষকে বেশি ভালাে বাসেন, সেহেতু তিনি তার বান্দাকে একেবারে অবহেলায় ফেলে দিতে পারেন না। প্রথমেই আল্লাহ এই শিশু সন্তানের জন্য তার মাতা-পিতার হৃদয়ে আকাক্ষা সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাকে পাওয়ার জন্য মাতা-পিতাকে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করে অর্জিত ধনকে বুকের হৃদয় নিংড়ানাে ভালােবাসা দিয়েই লালন-পালন করে থাকেন। আল্লাহ যদি এ মাধ্যম ছাড়া কোনাে মানব শিশুকে দুনিয়াতে পাঠাতেন, তবে এ শিশুর প্রতি কারাে দরদ থাকতাে না। তাকে কেউ বুকের নিংড়ানাে ভালােবাসা দিয়ে লালন-পালন করতাে না। অতএব দেখা যায়, আল্লাহর পরিকল্পনা কত সুন্দর! তিনি মানুষের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখেছেন। ফলে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে চলতে থাকবে পৃথিবীর শেষ সময় পর্যন্ত। মানুষের মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করে তাকে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। যারা মাতা-পিতা হয়েছেন, তাদেরকে আল্লাহ কী পরিমাণ মর্যাদা দান করেছেন অনেকেই হয়তাে নিজের মর্যাদা সম্পর্কেও অবগত নন । যে মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন সে মায়ের কী মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না। বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায় মাতা-পিতা তাদের নিজেদের সন্তান হত্যা করেছে আবার সন্তানও মাতা-পিতাকে হত্যা করছে। এর নেপথ্যে কারণ অনুসন্ধানে দেখা গেছে কেউ আসলে কারাে মর্যাদা সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে এই নিষ্ঠুর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আপনি তাে এই শিশুর তাকদির নির্মাতা নন, আল্লাহ তাকে পাঠিয়েছেন তার নির্দিষ্ট রিযিকের ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। সেক্ষেত্রে আপনি কেন হতাশ হবেন তার তাকদির নিয়ে? তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আপনি তাকে হত্যা করে ফেলবেন। এ অধিকার আপনাকে কে দিয়েছেন? এই অজ্ঞতা ও জুলুম প্রতিরাোধে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আপনাকে আল্লাহ সন্তান দান করেছেন তাে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। কতটুকু অনুগ্রহ করেছেন তা বুঝা যাবে যাকে সন্তান দেননি তার অবস্থা দেখে। এ সন্তান না পাওয়ার জন্য তার হৃদয়ে যে হাহাকার তা দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ আপনাকে কতটুকু অনুগ্রহ করেছেন। সন্তান আল্লাহ আপনার কাছে আমানত হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি যখন আবার এ আমানত ফেরত নেয়ার ইচ্ছে করেন, তখন তা আপনাকে অবশ্যই সন্তুষ্টচিত্তে ফেরত দিতে হবে। আপনার দায়িত্ব হচ্ছে এ আমানতের যথাযথ হেফাযত করা। তার প্রতি যে কর্তব্যগুলাে রয়েছে তা সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া। এ কর্তব্যগুলাে যদি সঠিকভাবে

আঞ্জাম দেয়ার পরে আল্লাহর এ আমানত যথাযথ বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে আল্লাহ আপনার জন্য জান্নাতে একটি মহল নির্ধারণ করে রেখেছেন।

মহান আল্লাহ তায়ালা এক পিতা একমাতা হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) থেকে মানবজাতির সৃষ্টির সূচনা করেন।

পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। মা বাবার মাধ্যমেই সন্তান দুনিয়াতে পাঠান। পিতা মাতার উপর সন্তান লালন-পালন ও সন্তান আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। শুধুমাত্র জন্মদানের মাধ্যমেই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বরং শিশু কিশোর যৌবন সকল বয়সেই সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

নেককার স্ত্রী গ্রহণ করা: আদর্শবান সন্তান পাবার জন্য একজন পুরুষকে প্রথমেই আদর্শবান স্ত্রী গ্রহণ করতে হবে। আদর্শবান পিতা-মাতার মাধ্যমেই আদর্শবান সন্তান পৃথিবীর মুখ দেখতে পারে।

পবিত্র কুরআনে এসেছে- যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, নিজ চরিত্র হিফাজত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা আল ফাতাহ, আয়াত নং ৫)

মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) এর এক হাদিসে রাসূল সাঃ) বলেছেনঃ নেককার স্ত্রী জান্নাতের মাঝে ৭০ হাজার রূপসী হুরদের থেকে উত্তম।

নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করা: সন্তান যেন নেককার হয় এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে নেককার সন্তান দান করুন। সূরা সাফাতের ১০০ আল ইমরানের ৩৮ নং আয়াতে উল্লেখ।

সন্তান জন্ম হলে করণীয়: সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক জন্মের পর ডান কানে আজান বাম কানে একামত দেওয়া। সপ্তম দিনে আকিকা করা ও সুন্দর নাম রাখা। সপ্তম দিনে মাথার চুল ফেলে চুল পরিমান সদকা দেওয়া। নবজাতকের মুখে খেজুর চিবিয়ে তাহনিক করা।

সন্তানকে আদব শিখানো: শিশু সন্তান যখন একটু একটু কথা বলতে শিখে তখন তাকে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ বলতে শিক্ষা দিবে। একে বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি হবে। ছোট বয়স থেকেই সন্তানকে সত্য ও ভালো কাজ শিক্ষা দিতে হবে।

সন্তানের সামনে যে কাজ করা ঠিক নয় : সন্তান যখন একটু বড় হতে থাকে তখন তার সামনে মিথ্যা বলা, গালাগালি করা, ঝগড়া করা, মারামারি করা ঠিক নয়। সন্তান পরিবার থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এজন্য তার সামনে এরকম কোন কাজ না করা যা তার জীবনের উপর প্রভাব পড়বে।

কুরআন ও ধর্ম শিক্ষা দেয়া: সন্তানের প্রথম শিক্ষক মা। মা তাঁকে ছোট ছোট দোয়া, সূরা শিক্ষা দিবে। সন্তান যখন আরেকটু বড় হবে তখন তাকে কুরআন ও ধর্ম শিক্ষা দিবে। এজন্য প্রাথমিক কুরআন ও ধর্ম শিক্ষা মক্তবের মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে। এতে করে সারা জীবন তার মধ্যে নামাজ, রোজা কুআন ও ধর্মের বিষয়টা মনে থাকবে। বড় হয়ে হয়তোবা সে অনেক বড় হবে। অনেক কাজ করবে। অনেক ব্যস্ত থাকবে। তারপরও ছোট বয়সের এই ধর্মীয় শিক্ষাটাই তার পুরো জীবনের জন্য কাজে আসবে। পবিত্র কুরআনের সূরা আলাক এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন - পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

ভালো সহপাঠিদের সাথে বন্ধুত্ব করা: মানুষ তার বন্ধুর অনুগামী হয়। এজন্য একটি সন্তানকে তার ভালো একটি বন্ধুর প্রয়োজন হয়। ভালো একজন বন্ধুই পারে তাকে ভালো পথে পরিচালিত করতে। এজন্য বন্ধু নির্বাচনে সৎ আদর্শবান, ধর্মপরায়ণ বন্ধুকে গ্রহণ করা উচিত। একজন ছেলে তার জন্য সৎ স্বভাবের আদর্শবান আরেকজন ছেলেকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। একজন মেয়ে আরেকজন মেয়েকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে। অসৎ বন্ধুর মাধ্যমে একটি সন্তান বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। এজন্য সন্তান কার সাথে চলে। কার সাথে বন্ধুত্ব করে পরিবারের জন্য তার খোঁজখবর রাখা উচিত। যাতে সে বিপদগামী না হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন: আমরা অনেক প্রতিষ্ঠান এমন দেখি যে, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা তাদের আদর্শ প্রচার করে থাকে। এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে তাদের আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এজন্য শিক্ষাজীবনে এমন প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা, যেখানে কোন অন্যায় অপরাধ এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ এবং ধর্মীয় উগ্রবাদীর স্থান না থাকে।

আদর্শবান শিক্ষক: সন্তানের জন্য আদর্শবান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন প্রয়োজন। তেমনি আদর্শবান শিক্ষকেরও প্রয়োজন রয়েছে। একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষা জীবনে শিক্ষকের আদর্শ নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে থাকে। এজন্য শিক্ষক যেন ধর্মীয় ন্যায় পরায়ন আদর্শবান হয় সেদিকে খেয়াল রাখা। সন্তানকে আদর্শবান শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান করা।

সন্তান বালেগ হলে: ইসলামে সন্তান-বালেক ও নাবালেক একটি বিষয় রয়েছে। সন্তান যখন বালেগ হয় তখন তার উপর আরোপিত ধর্মীয় কাজকর্ম গুলো তাকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এজন্য একজন অভিভাবক তার সন্তানকে বালেগ হওয়ার পূর্বেই ধর্মীয় রীতি নীতিগুলো শিক্ষা দিবে এবং বালেগ হওয়ার পর ধর্মীয় রীতি গুলো ঠিক মত পালনের বিষয়ে লক্ষ রাখবে।

যেমন, সন্তানের যখন সাত বছর হয় তখন তাকে নামাজের জন্য আদেশ করা। সন্তানের যখন ১০ বছর হয় নামাজ না পড়লে তাকে মৃদু প্রহার করা। সন্তানের বিছানা আলাদা করে দেয়া এবং সন্তান যখন বালেগ হয় তখন সে যেন পরিপূর্ণভাবে নামাজ পড়ে।

সন্তানকে সৎ উপদেশ দেয়া: আদর্শবান সন্তান গঠনের জন্য পিতা-মাতা সন্তানকে সৎ উপদেশ প্রদান করবে। যেমনিভাবে হযরত লোকমান হেকিম (আঃ) তার সন্তানকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। যা সূরা লোকমানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জগৎবাসীদের কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।সন্তানকে যখন ভালো উপদেশ দিতে থাকবে। আস্তে আস্তে তার মধ্যে সেই উপদেশগুলো অন্তরে গেঁথে তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ হবে।

হালাল ও হারামের জ্ঞান প্রদান করা: সন্তানকে হালাল ও হারামের জ্ঞান প্রদান করা। যেটা ইসলামী শরীয়তের আলোকে বৈধ সেটাই হালাল। যা ইসলামী শরীয়তের আলোকে অবৈধ সেটাই হারাম। সৎ ভাবে জীবন যাপন করা। অসৎ পথ ও অসৎ আচরণ থেকে দূরে থাকা।

উত্তম পোশাক পরিধান করা: ইসলামে পোশাকের কথা উল্লেখ রয়েছে। একজন আদর্শবান সন্তান সবসময় শালীন পোশাক পরিধান করবে। পুরুষের জন্য নাভি থেকে টাকনো ঢেকে রাখা ফরজ। মহিলাদের জন্য মুখমণ্ডল হাতের আঙ্গুল, পায়ের পাতা খোলা রাখা যায়। তবে তা পর পুরুষের সামনে নয়। এমন পোশাক পরিধান করা যাতে ছেলে এবং মেয়েদের শালীনতা বজায় থাকে। অনেক ছেলে ও মেয়েদের দেখা যায় পোশাকের ক্ষেত্রে নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়। যার মাধ্যমে আদর্শ সন্তান থেকে দূরে চলে যায়।

আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া: সন্তানকে আদব-কায়দা শিক্ষা প্রদান করা। কারণ! আদব কায়দার মাধ্যমে তার আদর্শ নীতি নৈতিকতা সৃষ্টি হবে। বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা। মা-বাবা, ওস্তাদ, মুরুব্বীদের ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকে তাদের অবস্থানে প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

হালাল রিজিক তালাশ করা: সকল অবস্থায় হালাল কাজ কর্ম করা। হালাল রিজিক তালাশ করা। হালাল রিজিক তালাশের জন্য সন্তানকে উপদেশ প্রদান করা। সন্তান হালাল বা বৈধ পন্থায় রোজগার করছে কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখা। সন্তানের রোজগারের উৎস কি সে বিষয়ে খোজ খবর রেখে সন্তানকে উপদেশ প্রদান করা। অনেকে যথা সময়ে যথাকর্ম বা কাজের তালাশ করতে গিয়ে অবৈধ ও অন্যায় পথে পা বাড়ায়। এ বিষয়ে ক্ষতি দিক গুলো সন্তানকে অবহিত করা এবং সাবধান করে দেওয়া। বিবাহের উপযুক্ত সন্তানকে বিবাহ দেয়া: বিবাহের উপযুক্ত সন্তানকে বিবাহ দেয়া। বিবাহের উপযুক্ত সন্তানকে বিবাহ না দিলে অনেক সময় অনৈতিক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। চোখ, মন ও নৈতিকতার জন্য বিবাহ অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত।

অবৈধ ভালোবাসা: সন্তান যেন কোনভাবেই অবৈধ ভালোবাসায় না জড়িয়ে পড়ে। সেদিকে পিতা-মাতাকে অবশ্যই তীক্ষè নজর দিতে হবে। ইসলামী শরীয়তের আলোকে তাকে এ বিষয়টি বুঝাতে হবে। একজন ছেলে শুধু বিবাহের মাধ্যমে আরেকটি মেয়েকে ভালবাসতে পারে এবং একজন মেয়ে বিবাহের মাধ্যমে আরেকজন পুরুষকে আপন করে তাকেই ভালবাসতে পারে। বিবাহ ছাড়া ভালোবাসা ধর্মীয় অনুভূতিতে সম্পূর্ণ হারাম ও অন্যায়, অপরাধ ও গুনাহের কাজ।

আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা: জীবনের প্রতিটি কাজে সন্তান যেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আস্থা রাখে। জীবনে শত বাঁধা-বিপত্তি। সুখ দুঃখ। ব্যথা বেদনার মধ্যেও নিজে হতাশ হয়ে না পড়ে বরং মহান আল্লাহর প্রতি আস্থা রেখে আল্লাহর কাছে কল্যাণের জন্য দোয়া করা। ইসলামী আদর্শমতে জীবনকে পরিচালিত করা।

হিংসা ও অহংকার মুক্ত হওয়া: হিংসা ও অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। হিংসা ও অহংকার একজন মানুষের জন্য ভয়াবহতা ডেকে আনতে পারে। হিংসা ও অহংকারের কারণে মানুষের নেক আমল গুলো বরবাদ হয়ে যায়। এজন্য হিংসা ও অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে। গর্ব অহংকার করে রাস্তায় চলাচল করা যাবে না। কথাবার্তায়, কাজকর্মে, সর্বস্থানে হিংসা ও অহংকার থেকে দূরে থাকতে হবে।

মাদক থেকে দূরে থাকা: মাদক একটি সুন্দর জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। সন্তান যাতে মাদকের সেবনে মধ্যে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তান যেন বিড়ি, সিগারেট, গাজা, বাবা, ইয়াবা বা মাদক সেবন না করে সে ব্যাপারে তাঁকে বুঝাতে হবে। ধর্মীয় অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে হবে।

গুনাহ থেকে দূরে থাকা: যাবতীয় গুনাহ থেকে দূরে থাকার আদেশ করা। পাশাপাশি গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করা। গুনাহের কারণে জাহান্নামের ভয়াবহ আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করা: সন্তানের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে হবে। যাতে করে তার জীবনটা ধর্মীয় অনুভূতির আলোকে পরিচালিত হয়। একটি সন্তানের মধ্যে যখন ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হবে তখনই সে সৎ আদর্শবান সু- সন্তান, নেক সন্তান বা একজন ভালো মানুষের মতোই জীবন যাপন করবে। তখন সে পিতা-মাতার হক আদায় করবে। ওস্তাদ মুরুব্বীদের সম্মান দিবে। স্ত্রীকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিবে। সন্তানকে তার সঠিক আদর্শে আদর্শিতবান করবে। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই সে একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবেই পরিগনিত হবে।

নেককারদের সোহবত: সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। এ প্রবাদটি আমরা সকলেই জানি। আমাদের সন্তানকে যদি কোন আল্লাহ ওয়ালা হক্কানী পীর মাশায়েখ। বুজুর্গ, সূফি, দরবেশ। আলেমওওলামার সাথে তাদের সোহবত অর্জন করে দেওয়া যায়। তাহলে তাদের পথে থেকে ভালো স্বভাব অর্জন করবে। এর মাধ্যমে দুনিয়া এবং আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ লাভ করতে পারবে।

পরিশেষে বলব, আদর্শবান সন্তান গঠনে পিতা-মাতা, শিক্ষক, মুরুব্বী, আত্মীয়-স্বজন, ভাই, কাকাও চাচা, প্রতিবেশি সহ সকলকেই সমানভাবে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে আদর্শবান করতে হলে আদর্শবান ব্যক্তিদের সাথে সন্তানকে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। যাতে ভালো ও আদর্শবান ব্যক্তিদের সাথে চলে সে আদর্শবান ও সৎ ব্যক্তিকে পরিনত হয়।

# ইসলামে সু-সন্তান তৈরির গুরুত্ব

মানুষের জীবনে সন্তান এমন এক অমূল্য সম্পদ, যা শুধু পারিবারিক আনন্দ ও বংশধারা রক্ষার মাধ্যম নয়, বরং ভবিষ্যতের নৈতিক, সামাজিক, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলাম সন্তানকে অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে দেখেছে এবং তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ বরকতময় একটি আমানত হিসেবে উল্লেখ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সু-সন্তান গঠন কোনো পারিবারিক বিষয় নয়—বরং এটি একটি ঈমানি দায়িত্ব, একটি নৈতিক কর্তব্য এবং একটি সামাজিক প্রয়োজন। তাই ইসলাম সু-সন্তান গঠনের জন্য যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ এমনভাবে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেনি।

১. সন্তান—একটি পবিত্র আমানত ও দায়িত্ব

ইসলামে সন্তানকে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র আমানত বলা হয়। কুরআনে এসেছে—

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

— সূরা আত-তাহরীম: ৬

এই আয়াতে “পরিবারকে রক্ষা করা” বলতে শুধু তাদের খাদ্য–বস্ত্র–বাসস্থান প্রদান বোঝায় না; বরং তাদেরকে ঈমান, ইবাদত, নৈতিকতা, চরিত্র, শিষ্টাচার ও সত্যের পথে পরিচালিত করাই মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং সন্তানকে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী গড়ে তোলা পিতা-মাতার ওপর ফরজ দায়িত্ব।

ইসলাম এখানে স্পষ্ট করেছে—

সন্তান কোনো শৌখিন সম্পদ নয়; বরং দায়িত্বপূর্ণ একটি আমানত, যার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে কিয়ামতের দিন।

২. সু-সন্তান—পিতা-মাতার আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম

ইসলামে সু-সন্তান গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো আখিরাতের সুবিধা। হাদিসে এসেছে—

“মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া— সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।”

— সহিহ মুসলিম

এই বাণী বোঝায়—

সন্তান যদি সৎ, নৈতিক, আল্লাহভীরু ও ইবাদতকারী হয়, তবে তার আমল পিতা-মাতার আমলনামায় সওয়াব হিসেবে যোগ হয়।
এমনকি সন্তানের প্রতিটি সৎ কাজ, দান, ইবাদত ও সত্যবাদিতার ফল পিতা-মাতার জন্য নেকি হয়ে জমা হতে থাকে।
অন্যভাবে বললে—
সু-সন্তান হলো এমন এক সম্পদ যা মৃত্যুর পরও পিতা-মাতাকে বাঁচিয়ে রাখে এবং তাদের আখিরাতকে উজ্জ্বল করে।

৩. সু-সন্তান সমাজ ও জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি
একটি সমাজ তখনই শান্তিপূর্ণ, সফল ও উন্নত হয় যখন সেখানে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, শিক্ষিত, দায়িত্বশীল মানুষ তৈরি হয়। আর এই মানুষগুলো কোথায় তৈরি হয়? পরিবারেই।
পরিবারের লালন-পালনই সমাজের মানসিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা তৈরির প্রথম ধাপ।
ইসলাম তাই বলে—
সু-সন্তান শুধু ব্যক্তিগত সম্পদ নয়, বরং পুরো সমাজের সম্পদ।
একজন সৎ সন্তান ভবিষ্যতে হতে পারে—
আলেম
ন্যায়পরায়ণ নেতা
দায়িত্ববান শিক্ষক
মানবিক ডাক্তার
বিজ্ঞানের গবেষক
নীতি-নৈতিকতায় অটল বিচারক
এসবই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির মূল।
অন্যদিকে, অসৎ সন্তান সমাজের জন্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে।
তাই ইসলাম প্রজন্ম গঠনে সু-সন্তানের গুরুত্ব সর্বোচ্চ করেছে।

৪. সু-সন্তান তৈরির কাজ শুরু হয় জন্মের আগেই
ইসলামের একটি বিস্ময়কর দিক হলো—
সু-সন্তান তৈরির শিক্ষা সন্তান জন্মের আগেই শুরু হয়ে যায়।

৪.১ সৎ সঙ্গী নির্বাচন

নবী ﷺ বলেছেন—
“নারীকে বিবাহ করা হয় চার কারণে... আর দ্বীনদার নারীকে গ্রহণ করো— তোমার কল্যাণ হবে।”
— বুখারি
পুরুষের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
সু-সন্তান পেতে হলে প্রথমেই দরকার সৎ, চরিত্রবান পিতা-মাতা।

৪.২ হালাল রিজিকের প্রভাব
ইসলামে বলা হয়—
যে খাবার, যে অর্থ, যে পুষ্টি দিয়ে সন্তান বেড়ে ওঠে— তা তার চরিত্র নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে।
অতএব,
হালাল খাদ্য হলো নৈতিকতার প্রথম ভিত্তি।

৪.৩ পিতা-মাতার দোয়া
ইসলাম গর্ভাবস্থাতেই ভালো সন্তানের জন্য দোয়া করতে বলে।
কুরআনে এসেছে—
“হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামাজ কায়েমকারী বানিয়ে দাও।”
— সূরা ইবরাহীম: ৪০
এ থেকে বোঝা যায়—
শুরু থেকেই সন্তানকে নৈতিকতার অঙ্গনে অন্তর্ভুক্ত করতে ইসলাম উৎসাহ দেয়।

৫. ছোটবেলা থেকেই ইসলামে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের নির্দেশনা
নবী ﷺ শিশু বয়স থেকেই সন্তানদেরকে ইবাদত ও নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দিতে বলেছেন।
৫.১ নামাজ শেখানো
হাদিসে এসেছে—
“তোমরা সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও।”

৫.২ সত্যবাদিতা এবং শিষ্টাচার
সু-সন্তানের অন্যতম গুণ হলো—
সত্য কথা বলা

বিশ্বস্ত হওয়া
শালীনতা
বড়দের সম্মান
ছোটদের প্রতি দয়া
দায়িত্ববোধ
পরোপকার
সহনশীলতা
ন্যায়পরায়ণতা
ইসলাম প্রতিটি গুণই শিশুর মধ্যে ছোট থেকেই গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছে।

৬. সন্তানকে ভালোবাসা, দয়া ও মর্যাদার সঙ্গে লালন-পালন
ইসলামের নবী ﷺ ছিলেন শিশুর প্রতি অপরিসীম দয়ালু।
তিনি বলেছেন—
“যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না।”
যে সন্তান ভালোবাসা পায়, সম্মান পায় এবং আদর্শ দেখে—
সে আবেগিকভাবে সুস্থ, সমবেদনা-সম্পন্ন, নৈতিক ও স্থিরচরিত্রবান হয়।

৬.১ শিশুর মনোবিজ্ঞান ইসলামের শিক্ষা
নবী ﷺ কখনো শিশুদের কঠোরভাবে দমন করতেন না; বরং উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করতেন, এবং ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করতেন।
এটি আজকের আধুনিক শিশুমনের বিজ্ঞানেও প্রমাণিত—
শিশুর প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদাবোধ তার ভবিষ্যৎ নৈতিক গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।

৭. সন্তানের ভুল সংশোধন—মমতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে
ইসলাম সতর্কভাবে বলে—
ভুল দেখলে শাসন করা যাবে, কিন্তু অপমান করা যাবে না।
ভালো কাজে উৎসাহ এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখাই আসল শিক্ষা।
একজন সু-সন্তান কখনোই শুধু ভয় দেখিয়ে তৈরি করা যায় না;
বরং আদর্শ, শিক্ষা, ভালোবাসা, দোয়া ও সঠিক দিকনির্দেশনা মিলেই গড়ে ওঠে।

৮. সু-সন্তান—দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তির উৎস

একজন সৎ সন্তান—

পিতা-মাতাকে সম্মান করে

পারিবারিক শান্তি বজায় রাখে

সত্য-ন্যায় ধরে রাখে

সমাজে ভালো কাজ করে

আল্লাহর পথে অটল থাকে

আখিরাতে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে

অন্যদিকে অসৎ সন্তান কখনো কখনো পিতা-মাতার জন্য দুনিয়াতেও কষ্টের এবং আখিরাতেও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাই কুরআনে বলা হয়েছে—

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষা।"

এটি মনে করিয়ে দেয়—

সু-সন্তান পাওয়া আল্লাহর রহমত;

আর তাকে সু-সন্তান বানানো পিতা-মাতার দায়িত্ব।

৯. উপসংহার

ইসলামে সু-সন্তান তৈরির গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর, বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক।

কারণ—

- সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র আমানত
- তাকে সৎভাবে গড়ে তোলা ফরজ দায়িত্ব
- সু-সন্তান পিতা-মাতার আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম
- সমাজ ও জাতির উন্নতির ভরকেন্দ্র
- নৈতিক, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ মানুষের উৎস
- দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই সুখ-শান্তির কারণ

ইসলাম তাই শুধু সন্তান জন্মানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়নি;

বরং সন্তানকে মানুষ বানানো,

সু-চরিত্র গঠন,

নৈতিকতা শেখানো,

দোয়া করা,

এবং
সঠিক আদর্শ দেখানোর ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

সু-সন্তান তৈরির বিষয়টি ইসলামে শুধু একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়—

- এটি একটি ঈমানি দায়িত্ব,
- একটি মানবিক দায়িত্ব
- এবং একটি আখিরাতের দায়িত্ব।

# নেককার সন্তান তৈরির সামাজিক উপকারিতা

—একটি বিস্তৃত সামাজিক, নৈতিক ও ইসলামী বিশ্লেষণ

মানুষ সমাজবদ্ধ প্রাণী। সমাজই মানুষের চরিত্র, মূল্যবোধ, আচরণ ও নৈতিকতা নির্ধারণে গভীর ভূমিকা পালন করে। আবার সমাজের কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে যে মানুষের ওপর, তারা অন্যদের আচার-ব্যবহারে প্রভাব ফেলে। এই বাস্তবতায় একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার সন্তানদের ওপর। শিশু আজ যে পরিবেশে বড় হয়, তা-ই আগামী দিনের সমাজ-রাষ্ট্রের চিত্র গড়ে তোলে। তাই নেককার বা সৎচরিত্রসম্পন্ন সন্তান তৈরির গুরুত্ব শুধু পরিবারের ভেতরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং পুরো সমাজের উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য।

ইসলাম সন্তানকে আল্লাহর নিয়ামত ও অমূল্য আমানত হিসেবে বিবেচনা করেছে। পাশাপাশি কুরআন ও হাদিসে বহুবার বলা হয়েছে, সৎ সন্তান সমাজের কল্যাণ ও শান্তির উৎস। নেক সন্তান শুধু পিতা-মাতার গর্বই নয়, বরং জাতির শক্তি, অগ্রগতির চালিকাশক্তি এবং সভ্যতার সুরক্ষক।

এ প্রবন্ধে নেক সন্তান তৈরির সামাজিক উপকারিতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

## ১. নেককার সন্তান—সুন্দর সমাজ নির্মাণের মূল ভিত্তি

সত্য, ন্যায়, নীতি ও মানবিকতা—এসব গুণ একদিনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় নেকচরিত্রসম্পন্ন মানুষদের মাধ্যমে। আর নেক সন্তানই হলো সেই মানুষদের প্রথম স্তর, যারা ছোটবেলা থেকেই নৈতিকতার প্রশিক্ষণ নিয়ে বড় হয়। তারা যখন বড় হয়, পুরো সমাজে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে।

নেক সন্তান মানবিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ ও ধৈর্যের ওপর সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তারা নিজেরা যেমন ভালো থাকে, অন্যদেরও ভালো থাকার শিক্ষা দেয়।

## ২. সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে

আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় সংকট হলো নৈতিকতার সংকট। দুর্নীতি, প্রতারণা, অবিচার ও অন্যায় বাড়ছে কারণ সমাজে নৈতিক চেতনা দুর্বল হয়ে পড়েছে। নেক সন্তান যখন পরিবারে ইসলামি আদর্শে বেড়ে ওঠে, তখন তারা—

মিথ্যা বলে না

প্রতারণা করে না

অন্যের ক্ষতি করে না

নেতিবাচক প্রবণতা থেকে দূরে থাকে
সত্য ও ন্যায় রক্ষা করে
ফলে সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা পায়।

৩. অপরাধহীন, নিরাপদ ও শান্তিময় সমাজ গড়ে তোলা
একটি সমাজে অপরাধ যত কম, ততই সেই সমাজ সমৃদ্ধ। অপরাধ সৃষ্টি হয়—
পারিবারিক অবহেলায়
নৈতিক শিক্ষার অভাবে
খারাপ বন্ধুদের সংস্পর্শে
অসুস্থ পরিবেশে
নেক সন্তান সৎচরিত্রপূর্ণ হওয়ায় তারা—
অপরাধ থেকে দূরে থাকে
মাদক, সন্ত্রাস, জুয়া, ব্যভিচারসহ সকল অনৈতিক কাজ বর্জন করে
অন্যদেরও খারাপ কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে
ফলে সমাজ অপরাধমুক্ত ও নিরাপদ হয়।

৪. নেতৃত্ব তৈরির মূল শক্তি
প্রতিটি সমাজেই প্রয়োজন নৈতিক, দৃঢ়চেতা, শান্তিপ্রিয় ও দায়িত্বশীল নেতৃত্ব। নেক সন্তানরা বড় হয়ে—
দুর্নীতিমুক্ত নেতা হয়
দেশপ্রেমিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করে
সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান দেয়
মানুষের সেবা করে
একজন নেক নেতা শুধু প্রশাসনে নয়, শিক্ষা, ধর্ম, অর্থনীতি, আইন, প্রযুক্তি—সকল ক্ষেত্রে জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

৫. সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা
সামাজিক স্থিতিশীলতা তখনই বজায় থাকে যখন সমাজে—
নিরাপত্তা থাকে
অপরাধ কম থাকে
মানুষ পরস্পরকে সম্মান করে

মিথ্যা ও প্রতারণার অবসান হয়
ন্যায়বিচারের চর্চা হয়
নেক সন্তান এই সকল গুণের বাহক। তারা—
সমাজের আইন মেনে চলে
ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়
অন্যকে সম্মান করে
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না
ফলে সামাজিক শান্তি স্থিতিশীল হয়।

৬. শিক্ষিত ও সচেতন প্রজন্ম তৈরি করে
নেক সন্তান শুধু আখলাকে নেক হয় না; তারা জ্ঞান চর্চাতেও এগিয়ে থাকে।
কারণ ইসলাম বলেছে—
"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।"
একজন সত্যিকার নেক সন্তান—
পরিশ্রমী হয়
শিক্ষার আলো নিয়ে বড় হয়
সমাজের অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর করে
গবেষণা ও সৃজনশীলতায় অবদান রাখে
ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন করতে পারে।

৭. দয়ালু, মানবিক ও সহানুভূতিশীল সমাজ গঠন করা
মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে গেলে সমাজে অস্থিরতা বাড়ে। নেক সন্তান মানবিকতার শিক্ষায় বড় হলে—
অসহায়কে সাহায্য করে
দান-সদকার মানসিকতা থাকে
প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হয়
সমাজে শান্তি ছড়িয়ে দেয়
দলমত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সম্মান করে
এদের প্রচেষ্টায় সমাজে মানবিকতা ও ভ্রাতৃত্বের শক্তি বাড়ে।

৮. পরিবার ও সমাজ উভয় জায়গায় স্থিতিশীলতা আনে

একজন নেক সন্তান—
পরিবারে শৃঙ্খলা বজায় রাখে
বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান দেখায়
ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্বশীল হয়
প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে
এভাবে একক পরিবার থেকে শুরু করে গোটা সমাজে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

৯. সমাজকে আল্লাহভীরু ও নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে
নেক সন্তান আল্লাহভীরুতায় বড় হয় বলে—
ভুল করলে ক্ষমা চায়
মানুষের হক নষ্ট করে না
সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে
অন্যায় ও জুলুম থেকে দূরে থাকে
এভাবে একেকজন নেক সন্তান সমাজে আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো সমাজের নৈতিক মান বাড়ায়।

১০. সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
সামাজিক উন্নয়ন শুধু ইট, বালু বা অর্থ দিয়ে হয় না; মানুষের চরিত্র, চিন্তাভাবনা ও মানসিকতা দিয়েও হয়। নেক সন্তান—
উদ্ভাবনী চিন্তা নিয়ে কাজ করে
সমাজের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে
পরিবেশ রক্ষায় সচেতন ভূমিকা রাখে
অন্যের ক্ষতি না করে কল্যাণমুখী কাজ করে
নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মান প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে
ফলে সমাজে বাস্তব উন্নয়ন ঘটে।

১১. দুশ্চিন্তামুক্ত সমাজ গঠন
একটি সমাজে অশান্তি বাড়ার অন্যতম কারণ হলো মানুষ পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে না পারা। নেক সন্তানরা—
অঙ্গীকার রক্ষা করে
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না

বিশ্বস্ত হয়
দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করে
ফলে সমাজে আস্থা তৈরি হয়, মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

১২. অর্থনৈতিক উন্নয়নেও নেক সন্তানের ভূমিকা
একজন সৎ, পরিশ্রমী, বিশ্বস্ত এবং দক্ষ মানুষ দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেয়। নেক সন্তান—
হালাল রিজিকের প্রতি গুরুত্ব দেয়
শ্রমকে সম্মান করে
ব্যবসায় সততা বজায় রাখে
দুর্নীতি কমায়
সম্পদ অপচয় করে না
এতে সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়।

উপসংহার
নেককার সন্তান তৈরি শুধু একটি পরিবারের দায়িত্ব নয়; বরং সমাজ, রাষ্ট্র ও পুরো মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনের অপরিহার্য স্তম্ভ। একজন নেক সন্তান—
নৈতিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলে
অপরাধহীন পরিবেশ তৈরি করে
নেতৃত্ব সৃষ্টি করে
সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে
শিক্ষিত ও সচেতন প্রজন্ম তৈরি করে
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান রাখে
ইসলাম, শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান—সব ক্ষেত্রেই নেক সন্তান তৈরির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই প্রতিটি পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজের উচিত শিশুদের নৈতিক, ধর্মীয়, মানবিক ও শিক্ষাগত বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া।
অবশেষে বলা যায়—
নেক সন্তানই হলো সেই আলোকশিখা, যা একটি জাতির ভবিষ্যৎ আলোকিত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করে।

# বর্তমান সমাজে সু-সন্তান তৈরির প্রতিবন্ধকতা

সমাজের উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষিত, নৈতিক ও চরিত্রবান নাগরিক প্রয়োজন, তেমনি সু-সন্তান লালন-পালন আজ মানবজাতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। ইসলাম-সহ সব ধর্মেই পিতামাতাকে সন্তানকে সৎপথে চালানো, নৈতিক মানদণ্ড শেখানো এবং কল্যাণকর জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—বর্তমান সময়ে সু-সন্তান তৈরি করা আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় কঠিন হয়ে পড়েছে। সমাজ পরিবর্তন, প্রযুক্তির আধিক্য, পরিবার কাঠামোর রূপান্তর, অর্থনৈতিক চাপ, নৈতিক অবক্ষয়—সবকিছু মিলে আজকের সন্তানরা বেড়ে উঠছে একটি জটিল পরিবেশে। ফলস্বরূপ, সু-সন্তান তৈরির পথ বাধাসঙ্কুল। নিচে কারণগুলো বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. প্রযুক্তি, স্মার্টফোন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব

বর্তমান সমাজে স্মার্টফোন হলো শিশুর হাতে সহজলভ্য "বিশ্বের দরজা"। এতে জ্ঞান আছে, কিন্তু একই সঙ্গে অজস্র ক্ষতিকর দিকও রয়েছে।

প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব

শিশু খুব অল্প বয়স থেকেই মোবাইল এবং ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে পড়ে।

অশ্লীলতা, সহিংসতা, অ্যালকোহল, মাদক সংক্রান্ত কনটেন্টে সহজ প্রবেশাধিকার রয়েছে।

সময় নষ্ট, মনোযোগ বিভ্রান্তি, পড়াশোনায় অনীহা, আচরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়।

সামাজিক দক্ষতা (Social Skills) কমে যায়, কারণ শিশুরা বাস্তব মানুষের তুলনায় পর্দাকে বেশি সময় দেয়।

মোবাইল হচ্ছে শিশুদের "নীরব শিক্ষক"—যার অধিকাংশ প্রভাব নিয়ন্ত্রণহীন। এ কারণে পরিবারের নৈতিক শিক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. পরিবারের ভাঙন, একক পরিবার ও অভিভাবকের পর্যাপ্ত সময়ের অভাব

আগের দিনে বড় পরিবারে দাদী-নানী, চাচা-চাচী, খালা-ফুপুদের মিলিত আবহে শিশু বেড়ে উঠত।

আজ—

পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন

একক পরিবার বৃদ্ধি

বাবা-মা চাকরি বা ব্যবসায় ব্যস্ত

শিশুর সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ কম

নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার সময় নেই

ফলে বাবা-মা সন্তানের আচরণ, বন্ধুমহল, অনলাইন কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে না। বাবা-মায়ের ভালোবাসা, দিকনির্দেশনা ও আদর্শ আচরণ শিশু ঘরে না পেলে বাইরের অস্থির পরিবেশেই চরিত্র গঠিত হয়।

৩. অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ও অতিরিক্ত শিক্ষাগত চাপ

বর্তমান সমাজে "ভালো ফল = ভালো সন্তান"—এমন ভুল ধারণা প্রবল।

শিক্ষাগত চাপে শিশুদের সমস্যা

আনন্দহীন শিক্ষা

মানসিক চাপ

সৃজনশীলতা কমে যাওয়া

হতাশা, হীনমন্যতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত

একদিকে শিশু সারাদিন কোচিং-স্কুল-হোমওয়ার্কে ব্যস্ত, অন্যদিকে নৈতিক শিক্ষা, মানবিকতা, সহমর্মিতা শেখার সময় পায় না। ফলস্বরূপ, পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও সে মানবিক বা নৈতিকতা-সমৃদ্ধ সন্তান হয়ে উঠতে পারে না।

৪. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

সমাজের সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয়ই বর্তমানে সু-সন্তান তৈরির সবচেয়ে বড় বাধা।

যে কারণে নৈতিকতা ক্ষয় হচ্ছে

ঘুষ, দুর্নীতি, প্রতারণা সমাজে স্বাভাবিক হয়ে যাওয়া

বড়দের অসৎ আচরণ শিশুর সামনে প্রকাশ পাওয়া

মিডিয়া ও নাটকে নৈতিকহীন চরিত্রকে জনপ্রিয় করা

বিনোদনে অশ্লীলতা ও সহিংসতা

শিশু যাকে দেখে, সেই রকমই হতে চায়। সমাজ যখন অসৎ মানুষকে বেশি সম্মান দেয়, তখন সু-সন্তান হতে শিশুর আগ্রহ কমে যায়।

৫. অর্থনৈতিক চাপ ও জীবনের ব্যস্ততা

বর্তমান জীবনে অর্থ উপার্জন কঠিন হয়ে গেছে। ফলে—

একসঙ্গে বাবা-মা দু'জনকেই কাজ করতে হয়

একা থাকে, অথবা ভার্চুয়াল মিডিয়া তার সঙ্গী হয়

বাবা-মায়ের যত্ন, সময় ও মানসিক সমর্থন কমে যায়
অর্থনৈতিক চাপের কারণে পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ, মানসিক অশান্তি বাড়ে। শিশু এসব দেখে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সঠিক চরিত্র বা মূল্যবোধ গড়ে ওঠে না।

৬. ভুল সঙ্গ, গ্যাং কালচার ও অপরাধে জড়িয়ে পড়া
শিশু-কিশোর বয়সে "বন্ধু" চরিত্র গঠনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।
বর্তমানে—
গ্যাং কালচার
রাস্তায় বখাটেপনা
মাদকাসক্ত বন্ধু
অপরাধমূলক টিকটক চ্যানেল
খারাপ ইউটিউব কনটেন্ট
এসব শিশুকে অতি দ্রুত বিপথে নিয়ে যায়। বাবা-মা বুঝতে বুঝতেই দেরি হয়ে যায়।

৭. ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক চর্চার অভাব
সু-সন্তান তৈরির জন্য ধর্মীয় শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজকের সমাজে—
কোরআন-হাদিসের মৌলিক জ্ঞান কম
নামাজ, আদব-কায়দা, সৎকর্ম শেখানো হয় না
অভিভাবকরাও নিজে ধর্মীয় চর্চায় দুর্বল
ধর্মীয় মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে গেলে শিশু স্বাভাবিকভাবে সৎপথ থেকে দূরে সরে যায়।

৮. ইমোশনাল অবহেলা (Emotional Neglect)
শিশুর শুধু খাবার-পোশাক নয়—ভালোবাসা, নিরাপত্তা, সম্মান, কথা শোনা এবং মানসিক সমর্থন দরকার।
আজকের সমাজে এ জিনিসগুলো কমে গেছে।
ফলে—
শিশু মানসিকভাবে রুক্ষ
আক্রমণাত্মক
অতিরিক্ত সংবেদনশীল
হতাশাগ্রস্ত
নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়

এই মানসিক বিকাশহীনতা চরিত্রবান ও সু-সন্তান হতে বাধা দেয়।

৯. দুঃসংবাদ, ভয়, যুদ্ধ, সহিংসতা—নেতিবাচক সামাজিক পরিবেশ
চারদিকে—
অপরাধ
ধর্ষণ
হত্যা
সামাজিক অবিচার
যুদ্ধবিগ্রহ
রাজনৈতিক অস্থিরতা
এসব শিশুর মনে ভয়, অবিশ্বাস, মানসিক চাপ তৈরি করে। নিরাপদ পরিবেশ ছাড়া সু-সন্তান গড়ে ওঠা কঠিন।

১০. অভিভাবকদের ভুল লালন-পালন পদ্ধতি
অনেক বাবা-মা সন্তানকে "শাসন" বা "শুধু পড়াশোনা" দিয়ে মানুষ করতে চান।
কিন্তু—
অতিরিক্ত চাপ
মারধর
তুলনা
অপমান
আদর–শাসনের ভারসাম্যহীনতা
এসব সন্তানের মনে বিদ্রোহী মনোভাব তৈরি করে। এমন মনোভাব সু-সন্তান হওয়ার অন্যতম বড় বাধা।

উপসংহার
সু-সন্তান তৈরি করা কখনোই অসম্ভব নয়, তবে বর্তমান সমাজে তা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কারণ শিশুর চরিত্র গঠনে পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, প্রযুক্তি, নৈতিকতা—সবকিছুই ভূমিকা রাখে, যার প্রতিটিতে আজ সংকট আছে। তাই সু-সন্তান পেতে হলে—

- পরিবারের সময় ও আদর্শ আচরণ
- প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ
- নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা

- সুন্দর সামাজিক পরিবেশ
- ভালো বন্ধু
- সহানুভূতিশীল লালন-পালন
- ইতিবাচক পারিবারিক আবহ
- এসব গড়ে তুলতে হবে।

পরিবেশ যত কঠিন হবে, সু-সন্তান তৈরির প্রচেষ্টা তত সত্য ও সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন।

নেককার সন্তান তৈরির প্রতিবন্ধকতাসমূহের প্রতিকার

নেককার বা সৎ সন্তান একটি পরিবারের সাজসজ্জা, সমাজের সম্পদ এবং জাতির ভবিষ্যৎ। ইসলামে নেক সন্তানকে বলা হয়েছে পিতা–মাতার জন্য চলমান সওয়াব (সদকায়ে জারিয়া)। আবার সৎ সন্তান সমাজে শান্তি, ন্যায়, কল্যাণ ও মানবতার ভিত্তি স্থাপন করে। কিন্তু আজকের যুগে নেক সন্তান গঠন ক্রমেই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অশ্লীলতা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক টানাপোড়েন—এসব প্রতিবন্ধকতা সন্তানকে নেক পথে হাঁটতে বাধা দেয়। তাই শুধু প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করলেই হবে না; এর কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাই জরুরি।

এই পর্যায়ে নেককার সন্তান তৈরির প্রতিবন্ধকতাসমূহের কার্যকর প্রতিকার ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি, মনোবিজ্ঞানের আলো ও আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণসহ তুলে ধরা হলো।

১. সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গঠন

১.১ দাম্পত্য জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা

একটি সুশৃঙ্খল পরিবারই নেক সন্তান তৈরির প্রথম শর্ত। ঘরে যদি ঝগড়া–কলহ, চিৎকার–চেঁচামেচি, পরস্পরকে দোষ দেওয়ার রেওয়াজ থাকে, তবে সন্তান কখনো নেক হতে পারে না।

প্রতিকার

দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য, পারস্পরিক সম্মান ও ক্ষমাশীলতা চর্চা করা।

আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত রাখা।

সমস্যা হলে আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা।

ঘরে এমন পরিবেশ রাখা যাতে সন্তান নিরাপত্তা ও শান্তি পায়।

২. পিতামাতার দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি

২.১ সন্তানকে সময় দেওয়া

সন্তানকে সময় না দেওয়া নেক সন্তান তৈরির বড় প্রতিবন্ধকতা। সন্তান যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে, সেই পরিবেশই তার চরিত্র গড়ে।

প্রতিকার

প্রতিদিন অন্তত ৩০–৬০ মিনিট সন্তানের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানো।

তার কথা শোনা, অনুভূতি বুঝা, সমস্যা জানার চেষ্টা করা।

"ফোন–ল্যাপটপ" দূরে রেখে পারিবারিক সময় নির্ধারণ করা।

২.২ পিতামাতার আদর্শ আচরণ

পিতামাতা যা করেন, সন্তানও তা-ই শেখে। যদি পিতামাতাই মিথ্যা বলেন, রাগ করেন বা অন্যায় করেন—সন্তান কখনো নেক হতে পারে না।

প্রতিকার

নিজের চরিত্রকে শুদ্ধ করা।

ঘরে মিথ্যা, গীবত, অপবচন পরিহার করা।

শিশুকে দেখানো—"ইসলাম শুধু কথায় নয়, কাজে"।

৩. ধর্মীয় শিক্ষা ও আল্লাহভীতির চর্চা

৩.১ নিয়মিত কুরআন শিক্ষা

ইসলামী মূল্যবোধ ছাড়া নেককার হওয়া সম্ভব নয়।

প্রতিকার

শিশুকে ছোটবেলা থেকে কুরআন শেখানো।

বোঝানোর মাধ্যমে তার মাঝে আল্লাহভীতি ও নৈতিক সাহস তৈরি করা।

ঘরে কুরআন পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

**৩.২ নামাজের অভ্যাস করানো**

নামাজ চরিত্র গঠন করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

প্রতিকার

পিতামাতা নিজে নামাজ পড়লে সন্তানও আগ্রহী হবে।

সন্তানকে ৭ বছর বয়স থেকেই নামাজের অভ্যাস করানো।

মসজিদে নিয়ে যাওয়া, ঈমানী আলোচনা করা।

৪. খারাপ সঙ্গ থেকে সন্তানকে দূরে রাখা

বন্ধুত্ব চরিত্র বদলের সবচেয়ে দ্রুত মাধ্যম।

**প্রতিকার**

সন্তানের বন্ধু–বৃত্ত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা।

ভালো বন্ধু বেছে নিতে সহায়তা করা।

খারাপ বন্ধুর প্রভাব ব্যাখ্যা করে বোঝানো।

পরিবারে এমন যোগাযোগ গড়ে তোলা যাতে সন্তান গোপনে খারাপ পথে না যায়।

৫. প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ

বর্তমান যুগে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো অশ্লীলতা, গেমিং আসক্তি ও স্মার্টফোনের অপব্যবহার।

**প্রতিকার**

৫.১ স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ

১০ বছরের নিচে স্মার্টফোন না দেওয়া।

বড়দের ক্ষেত্রেও সময়সীমা নির্ধারণ করা।

ইউটিউব কিডস বা নিরাপদ ব্রাউজার ব্যবহার করা।

ঘরে খোলামেলা স্থানে ফোন ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৫.২ ইন্টারনেট সম্পর্কে সচেতনতা

ইন্টারনেটের ভালো–মন্দ দুটোই বোঝানো।

অশ্লীলতা (পর্ন) দেখার ক্ষতি এবং পাপ বোঝানো।

সাইবার বুলিং, প্রাইভেসি ও নেটিকুয়েট শেখানো।

৫.৩ বিকল্প ভালো কাজের সুযোগ সৃষ্টি

যেমন—

- বই পড়া
- খেলাধুলা
- হবি ডেভেলপমেন্ট
- ইসলামিক স্টোরি দেখা
- সৃজনশীল কাজ

এভাবে সন্তান ইন্টারনেটের ওপর নির্ভরশীল হবে না।

৬. নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্র উন্নয়ন

৬.১ ভালো–মন্দের পার্থক্য বোঝানো

শিশুকে প্রতিদিন ছোট ছোট নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে—

মিথ্যা বলা হারাম

অন্যকে কষ্ট দেওয়া অপরাধ

বড়দের সম্মান

খাবার, পানি, সময়—অপচয় না করা

সৎ, দয়ালু ও দায়িত্বশীল হওয়া

৬.২ রাসূল ﷺ–এর চরিত্র তুলে ধরা

শিশুকে বোঝানো—

“নেককার মানুষের মূল আদর্শ হলো রাসূল ﷺ।”

তার—

- সততা
- কোমলতা
- ধৈর্য
- দয়া
- ন্যায়

–শিক্ষাগুলো গল্পের মতো করে শেখানো যেতে পারে।

৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা

এমন স্কুল নির্বাচন করা যেখানে নৈতিকতা, ইসলামিক স্টাডিজ ও মানবিক মূল্যবোধ শেখানো হয়।

শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

সন্তানের আচরণ, পড়াশোনা, বন্ধু—সব দিকের খবর রাখা।

বাড়িতে পড়াশোনার পাশাপাশি দ্বীনি জ্ঞান শেখানো।

৮. অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক ব্যবস্থাপনা

৮.১ দারিদ্র্য রোধ

দারিদ্র্য সন্তানকে শিক্ষা থেকে দূরে সরায়।

প্রতিকার

সঞ্চয় ও পরিকল্পিত ব্যয়

শিশুকে সঠিক শিক্ষা সুযোগ দেওয়া
সরকারি বা সামাজিক সহায়তা ব্যবহার করা
অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো

৮.২ বিলাসিতা থেকে বাঁচানো
বিলাসিতা সন্তানকে নষ্ট করে।
প্রতিকার
সম্পদের প্রতি আকাঙ্ক্ষা নয়—সাধারণতা শেখানো
টাকা–পয়সার মূল্য বোঝানো
সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাপন

৯. মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা
সন্তানকে দোষারোপ নয়—প্রশংসা করা
তার আবেগ বুঝে নেওয়া
তুলনা না করা
ভুল করলে শাসন নয়—বোঝানো
নিরাপদ ও ভালোবাসাময় পরিবেশ তৈরি করা
তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা

১০. দোয়া, তাওয়াক্কুল ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতা
নেক সন্তান আল্লাহর দান। তাই দোয়া সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
অভিভাবকের দোয়া
রাসূল ﷺ শিখিয়েছেন—

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো।”
সন্তানের জন্য নিয়মিত দোয়া করা
নামাজে, তাহাজ্জুদে, রমজানে সন্তানের জন্য কল্যাণ চাওয়া
যেখানে দোয়া হয়, সেখানে চরিত্র গঠনের শক্তি হাজির হয়।

১১. ইসলামী সংস্কৃতি ও পরিচয় জাগ্রত করা
ইসলামী উৎসব ও ঐতিহ্য সন্তানকে শেখানো

হালাল–হারামের ধারণা দেওয়া
সাহাবীদের জীবন কাহিনি পড়ানো
পরিবারের মধ্যে ইসলামি চর্চা প্রচলিত করা

১২. সমাজে নৈতিক পরিবেশ গঠন
সমাজে মসজিদ–মাদ্রাসার কার্যক্রম সক্রিয় করা
ভালো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ানো
খারাপ পরিবেশ, অশ্লীলতা ও অপরাধ থেকে দূরে থাকা
ইসলামিক সংগঠনের মাধ্যমে শিশু–কিশোরদের শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করা

নেককার সন্তান তৈরি কোনো একদিনের কাজ নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া, যা পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, নৈতিকতা ও ধর্মীয় চর্চার সম্মিলিত প্রয়াসে সফল হয়। আজকের যুগে অশ্লীলতা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, নৈতিক সংকট, পারিবারিক অশান্তি—এসব প্রতিবন্ধকতা যতই বাড়ুক না কেন, সচেতন অভিভাবক হলে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করলে নেককার সন্তান গড়া সম্ভব।

প্রতিকারের মূল তিন পথ হলো—
১. সুন্দর পরিবার
২. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা
৩. আল্লাহভীতি ও দোয়া

নেক সন্তান শুধু পিতা–মাতার নয়, সমাজেরও গৌরব। তাই সন্তান গঠনে দায়িত্বশীলতা, ধৈর্য, ভালোবাসা, আদর্শ আচরণ এবং নিয়মিত দোয়া—এগুলোই নেককার সন্তান তৈরির সর্বোত্তম প্রতিকার।

# নেককার সন্তান জান্নাতের পথ সুগম করে

মানবজীবনের সর্বোচ্চ সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং জান্নাত লাভ করা। পৃথিবীর সামান্য সময়ের এই জীবনে মানুষ যে সন্তান লাভ করে, তা সুখ-দুঃখের অংশীদার, দুনিয়ার পরীক্ষার অংশ এবং পরকালীন পুরস্কারের এক বিশাল উপকরণ। ইসলাম সন্তানকে মানুষের ওপর আল্লাহর বিরাট নিয়ামত হিসেবে ঘোষণা করেছে। বিশেষত, নেককার, বাধ্য, আল্লাহভীরু ও ভালো চরিত্রের সন্তান পিতা-মাতার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়—এটি কুরআন-হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য।

সন্তান মানুষের ইচ্ছামতো আসে না; এটি আল্লাহর দান। কিন্তু সন্তানকে নেককার বানানো—এটি বাবা-মায়ের অন্যতম বড় দায়িত্ব। নেক সন্তান শুধু পিতা-মাতার চোখের শীতলতা নয়, বরং তাদের মৃত্যুর পরেও সদা চলমান সওয়াবের উৎস। তাই নেককার সন্তানকে ইসলাম জীবনের বড় সফলতা ও বিনিয়োগ বলে উল্লেখ করেছে।

১. নেককার সন্তানের গুরুত্ব: কুরআনের আলোকে

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বহু স্থানে সন্তানকে "আনন্দের চোখ" এবং পরিবারকে "শান্তির আবাস" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিশেষত, সূরা ফুরকান-এর মুমিন বান্দাদের দোয়া—

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানাও।"

(সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

এটি প্রমাণ করে যে, নেককার সন্তান পিতা-মাতাকে শুধু দুনিয়াতে সুখ দেয় না, বরং তাদেরকে পরকালের সাফল্যের পথেও এগিয়ে দেয়।

কুরআন বলে—

"সম্পদ ও সন্তান হলো দুনিয়ার শোভা।" (সূরা কাহফ: ৪৬)

কিন্তু একই আয়াতে আল্লাহ আরও বলেন—

"কিন্তু স্থায়ী নেক আমলই উত্তম প্রতিদান ও উত্তম প্রত্যাশা।"

এখানে নেককার সন্তানও নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত, কারণ এমন সন্তান পিতা-মাতার আমানত, যার ভালো শিক্ষা ও লালন-পালন তাদের দুনিয়া-আখিরাত উজ্জ্বল করতে পারে।

২. হাদিসে নেককার সন্তানের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন—

"মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি অব্যাহত থাকে—

১) সদকা জারিয়া,
২) উপকারী জ্ঞান,
৩) নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"(সহিহ মুসলিম)
এই হাদিস প্রমাণ করে, নেক সন্তান পিতা-মাতার মৃত্যু পরবর্তী অব্যাহত সওয়াবের প্রধান উৎস।
আরো একটি হাদিসে আছে—
"যে ব্যক্তি তার সন্তানকে ভালো আদব শিক্ষা দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে সম্মানিত করবেন।"
তাই সন্তানকে নেক বানানোর প্রচেষ্টা পিতা-মাতার জন্য বিশাল ইবাদত, যা জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়।

৩. কেন নেককার সন্তান জান্নাতের পথ সুগম করে?
(১) মৃত্যুর পর দোয়ার মাধ্যমে উপকার করে
নেক সন্তান প্রতিনিয়ত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে। তাদের মাগফিরাত চায়। এই দোয়া কবুল হলে পিতা-মাতার আখিরাতে মর্যাদা বাড়ে।
(২) সওয়াবের ধারা বহমান রাখে
পিতা-মাতা সন্তানের মধ্যে যে বিশ্বাস, আখলাক, জ্ঞান, নৈতিকতা ও আমল শিক্ষা দেন, সন্তান সেসব আমল করলে তার সওয়াবও পিতা-মাতার আমলনামায় যায়।
(৩) সমাজে পিতা-মাতার নাম উজ্জ্বল করে
যে পিতা-মাতা নেক সন্তান রেখে যান, সমাজ তাদের সম্মান করে। সমাজে ভালো সন্তান তাদের পরিবারের জন্য ইজ্জত আনে, আর ইজ্জত আল্লাহর দেওয়া এক নিয়ামত।
(৪) জান্নাতের দরজা খোলে দেয়
রাসূল (সঃ) বলেছেন—
"বাবা মধ্যবর্তী জান্নাতের দরজা।"(তিরমিজি)
অন্যদিকে, নেক সন্তান পিতা-মাতার প্রতি যে আনুগত্য ও সেবা করে, তা পিতা-মাতার জান্নাত পাওয়ার প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়।
(৫) তাদের গুনাহ মাফের কারণ হয়
বলা হয়, যদি পিতা-মাতা তাদের সাধ্যের সবটুকু দিয়ে সন্তানকে নেক বানানোর চেষ্টা করেন, আল্লাহ তা তাদের গুনাহ মাফেরও কারণ করেন।

৪. নেককার সন্তান গড়ার উপায়

নেক সন্তান জন্ম থেকে তৈরি হয় না; বরং সঠিক লালন-পালন, পরিবেশ, দোয়া, আদর্শ, ইসলামী শিক্ষা ও ভালোবাসার মাধ্যমে তৈরি হয়। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় তুলে ধরা হলো—

(১) পিতা-মাতার নিজের নেক হওয়া

শিশু পিতা-মাতাকে দেখে শিখে। তাই নিজের আমল, আচরণ ও কথাবার্তায় নেক হতে হবে।

(২) দোয়া করা

নবীরা সবসময় নেক সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন। দোয়া সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

(৩) সঠিক আদব-আখলাক শেখানো

সন্তান যেন সত্যবাদী, নম্র, পরোপকারী, দায়িত্বশীল ও ধৈর্যশীল হয়—এগুলো ছোট থেকেই শেখাতে হবে।

(৪) কুরআন ও দ্বীন শিক্ষায় প্রশিক্ষিত কর

কুরআন শিক্ষা, সালাত, শিষ্টাচার, হালাল-হারামের জ্ঞান—এসব নেক সন্তান তৈরির মূলভিত্তি।

(৫) হালাল উপার্জনে লালন-পালন

হালাল খাদ্য মানুষের হৃদয়কে নেক বানায়; হারাম খাদ্য নেক হবার পথে বড় বাধা।

(৬) ভালো পরিবেশ দেওয়া

বন্ধু, বিদ্যালয়, পরিবার, ব্যবহারিক জীবন—সব ক্ষেত্রেই শিশুকে ভালো পরিবেশ দিতে হবে।

(৭) অতিরিক্ত বকুনি নয়, ভালোবাসা ও পরামর্শ

ভালোবাসায় সন্তান শোধরায়, বকুনি ও অপমান তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

(৮) প্রযুক্তি ব্যবহারে সঠিক নিয়ন্ত্রণ

আজকের শিশুদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিভ্রান্তিকর ডিজিটাল জগৎ। তাই তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ জরুরি।

৫. নেককার সন্তান সমাজের জন্য আশীর্বাদ

শুধু পরিবারের জন্য নয়, নেক সন্তান সমাজ ও জাতির জন্যও কল্যাণের উৎস।

তারা—

অন্যায়, দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখে,

দেশ ও সমাজকে উন্নত করে,

সৃষ্টিশীল কাজ করে,

দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে ভূমিকা রাখে।

ইসলাম চায় এমন সমাজ যেখানে মানুষ আল্লাহভীরু, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী ও শান্তিপ্রিয় হবে। নেক সন্তানই সেই সমাজ গড়ার মূল ভিত্তি।

৬. পিতা-মাতার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা—এক ভয়াবহ ক্ষতি
যদি সন্তানকে সঠিক পথে লালন-পালন করা না হয়, তবে তারা—
সমাজে অপকারকারী হতে পারে,
পিতা-মাতার জন্য দুনিয়াতে দুঃখের কারণ হয়,
পরকালে রাগ ও গুনাহের কারণ হতে পারে।
কুরআনে এমন পিতা-মাতার জন্য সতর্কবাণী আছে যারা সন্তানকে আল্লাহর পথে না আনিয়ে বিপথে চালিত করে।

৭. নেককার সন্তান—জান্নাতের পথে আলোর বাতি
নেক সন্তান পিতা-মাতার জীবনে এবং মৃত্যুর পর উভয় অবস্থাতেই আলোর প্রদীপের মতো। তাদের দোয়া, আমল, চরিত্র এবং পথচলা পিতা-মাতাকে জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যায়।
একজন নেক সন্তান যখন রাতে কেঁদে আল্লাহর কাছে দোয়া করে—
“হে আল্লাহ, আমার বাবা-মাকে মাফ করে দাও”
—তখন সেই দোয়ার আলো কবরের অন্ধকার ভেদ করে তাদের জন্য রহমত নিয়ে আসে।

# উপসংহার

“নেককার সন্তান জান্নাতের পথ সুগম করে”—এটি ইসলামী জীবনের এক গভীর সত্য। সন্তান পরিবারের সঞ্চয়, জাতির ভবিষ্যৎ, এবং মৃত্যুর পর পিতা-মাতার চলমান সওয়াবের উৎস। তাই প্রতিটি মুসলিম পরিবারকে উচিত সন্তানের লালন-পালনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। নেককার সন্তান শুধু পিতা-মাতার জন্য নয়, সমাজ ও উম্মাহর জন্য আশীর্বাদ। তারা দুনিয়াকে শান্তিময় এবং আখিরাতকে সফলতার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলে।

ইসলামে নেককার আদর্শ সন্তান তৈরির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা আমাদের নেককার সন্তান লাভের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, সূরা ফুরকানের ৭৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন,

لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا

আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। তিনি আরো বলেছেন সন্তান সন্তানাদি আমাদের জন্য পরিক্ষা স্বরূপ, যারা সঠিকভাবে সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারবে, ইসলামি আদর্শে গড়ে তুলতে পারবে তারাই সফলকাম এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা তাদের জন্য রাখছে মহা পুরস্কার।অন্য দিকে যারা সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারবে না, ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে পারবে না তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা জাহান্নামের শাস্তি রেখেছেন।

অতএব, আমাদের দায়িত্ব সন্তানকে শুধু বড় করা নয়; বরং নেককার, সৎ, চরিত্রবান ও আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা—যারা পিতা-মাতার জান্নাতের পথকে আলোকিত করতে পারে।

**তথ্যসূত্র**


i. সূরাঃ আল-আনফাল আয়াত: ২৮, কুরআনুল কারিম, তাফসিরে মারেফুল কুরআন।
ii. সূরা ফুরাকান আয়াত -৭৪, কিরআনুল কারিম।
iii. সূরাঃ আত-তাগাবুন আয়াত : ১৫, কুরআনুল কারিম, তাফসিরে মারেফুল কুরআন।
iv. সূরাঃ আত-তাগাবুন আয়াত : ১৪, কুরআনুল কারিম, তাফসিরে মারেফুল কুরআন।
v. সূরা মরিয়ম আয়াত:৫ কুরআনুল কারিম, তাফসিরে মারেফুল কুরআন।
vi. সূরাঃ আশ-শূরা আয়াত : ৪৯, কুরআনুল কারিম, তাফসিরে আল বায়ান

vii. সূরাঃ আশ-শূরা আয়াত : ৫০, কুরআনুল কারিম ।
viii. সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল) আয়াত : ৩১
ix. সূরাঃ আল-আহকাফ, আয়াত :১৫, তাফসির ইবনে কাসির।
x. সহীহ বুখারি- ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৬৬৫৩ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৭১৩৮
xi. বুখারী ১৮, মুসলিম ১৭০৯
xii. সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ৪৪১৭ , আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৪৭৭৫
xiii. সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), সালাতের অধ্যায়, হাদিস নাম্বার -৪৯৪
xiv. সুনান আবূ দাউদ (তাহকিককৃত), সালাতের অধ্যায়, হাদিস নাম্বার -৪৯৫
xv. মোঃ মোস্তফা জামান, আদর্শ সন্তান গঠনে মাতা-পিতার করণীয়।
xvi. মুফতি মুহাঃ আবু বকর বিন ফারুক, ইমাম ও খতিব, বিষ্ণুপুর মনোহরখাদী মদিনা বাজার বাইতুল আমিন জামে মসজিদ, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।